Rajshahi University journal of arts & law Vol. 53 (2025) pp. 85-89
ISSN 2309-0898 (Print), 2408-8773 (Online)
https://doi.org/10.64102/rujal.0727

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের নিরপেক্ষতা ও বৃহৎ শক্তির চাপ
[Turkish Neutrality and Great Power Pressure in the Second World War]

মো. ওসমান গণি*

Abstract

The official name of Turkiye is the Republic of Turkiye. Turkiye is an important country in terms of geographical location. Turkiye comprises the entirety of the Anatolian Peninsula in south-west Asia and parts of the Southern tip of the Balkan Peninsula in south-east Europe. This area was very important from the point of view of military location. Throughout the history of human civilization, Turkiye has served as a bridge for the movement of people between Asia and Europe. Turkiye was a neutral country at the beginning of the Second World War. Because of its strategic importance, both the Allies and the Central Powers sought to recruit Turkiye to their side at the start of the Second World War. At that time, the Allies and Axis Powers invested in Turkiye to attract the country to their side. The Turkish general public and military officials were unwilling to participate in the Second World War. So it can be said that Turkiye was completely neutral in the Second World War. Turkiye did not participate in any groups.

Keywords: Turkiye, Germany, The Second world war, Treaty of Ankara, Britain, Bulgaria, Italy, Allied powers, Russia.

ভূমিকা

বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে তুরস্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ। এটি পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের একটি দেশ যার সরকারী নাম হলো প্রজাতন্ত্রী তুরস্ক। দেশটির উত্তরে রয়েছে কৃষ্ণ সাগর, বসফরাস প্রণালি ও ইউক্রেন, দক্ষিণে রয়েছে সিরিয়া, লেবানন, বাগদাদ ও সাইপ্রাস, পূর্বে রয়েছে মর্মর সাগর, ইজিয়ান সাগর, গ্রীস ও ভূমধ্যসাগর, পশ্চিমে রয়েছে আর্মেনিয়া, আজারবাইজান ও কাস্পিয়ান সাগর। দেশটির রাজধানী আঙ্কারা আনাতোলিয়াতে অবস্থিত। সামরিক কৌশলগত দিক থেকে দেশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলটি উর্বর উচু-নিচু, টিলা পাহাড় নিয়ে গঠিত। বসফরাস প্রণালি, দার্দানেলস প্রণালি, মর্মর সাগর তুরস্কের এশিয়া ও ইউরোপীয় অংশকে পৃথক করেছে। এই তিনটি জলপথ একত্রে কৃষ্ণ সাগর থেকে ইজিয়ান সাগরে যাবার একমাত্র পথ তৈরি করেছে। এছাড়া পূর্বে আছে সুউচ্চ পর্বতমালা। দেশটি ইউরোপ ও এশিয়ার মানুষের সেতু হিসাবে কাজ করছে। দেশটির ৯৯% অধিবাসী মুসলমান।[১] দেশটির আয়তন ৭,৮০,৫৬৭ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা প্রায় ৮ কোটি ৩০ লক্ষ। মানব সভ্যতার ইতিহাসে তুর্কিদের মতো এতো সংখ্যক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী জাতি পৃথিবীতে আর নেই। বিশ্ব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রথম সভ্যরাষ্ট্র হতে আরম্ভ করে এশিয়া ও ইউরোপের যুবরাজ শাসিত রাজ্য, নৃপতি শাসিত রাষ্ট্র বা সম্রাট শাসিত সাম্রাজ্যসমূহ তুর্কিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভৌগোলিক গুরুত্বের কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্র শক্তি ও অক্ষ শক্তি তুরস্ককে তাদের নিজ দলে আনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তুরস্ক এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ছিল নিরপেক্ষ।

* পিএইচ.ডি গবেষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, বাংলাদেশ; ই-মেইল: osmangani673643@gmail.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সারসংক্ষেপ (১৯৩৯-১৯৪৫)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সংঘটিত একটি বৈশ্বিক যুদ্ধ। এটি মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বৃহৎ ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ, যেখানে প্রায় ১০০টিরও বেশি দেশ অংশগ্রহণ করে এবং প্রায় ৭ কোটির বেশি মানুষ নিহত হয়। এই যুদ্ধ শুরু হয় জার্মানির নাৎসি নেতা অ্যাডলফ হিটলারের নেতৃত্বে পোল্যান্ড আক্রমণের মাধ্যমে। এর ফলে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধ দুইটি পক্ষকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়: অক্ষ শক্তি (জার্মানি, ইতালি, জাপান) এবং মিত্র শক্তি (যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও অন্যান্য)। হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানি ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে নেয়। ইতালি উত্তর আফ্রিকায় এবং জাপান এশিয়ায় আগ্রাসন চালায়। ১৯৪১ সালে জার্মানি সোভিয়েত 'ইউনিয়নে হামলা চালায় এবং একই বছরে জাপান পার্ল হারবারে আক্রমণ করলে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধের টার্নিং পয়েন্ট ছিল ১৯৪৪ সালের ডি-ডে অভিযান, যখন মিত্রশক্তি ফ্রান্সে আক্রমণ চালিয়ে পশ্চিম ফ্রন্টে অগ্রসর হয়। ১৯৪৫ সালে বার্লিন দখলের পর হিটলার আত্মহত্যা করেন এবং জার্মানি আত্মসমর্পণ করে। এরপর যুক্তরাষ্ট্র হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা ফেললে জাপানও আত্মসমর্পণ করে। যুদ্ধের ফলাফল হিসেবে জাতিসংঘ (UN) গঠিত হয়, জার্মানি বিভক্ত হয় এবং স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিশ্ব রাজনীতির গতিপথ, শক্তির ভারসাম্য এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কাঠামো আমূল পরিবর্তন করে দেয়।

ফ্রান্সের পরাজয় ও তুরস্ক

জার্মানি ১৯৪০ সালে ফ্রান্স আক্রমণ করে। এ সময়ে জার্মানির সাথে ইতালিও যুদ্ধে যোগদান করে। ১৯৩৯ সালে আঙ্কারা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং এ চুক্তি অনুসারে তুরস্কের মিত্র পক্ষে যোগদানের কথা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুরস্ক যুদ্ধে যোগদান করেনি। তুরস্ক যুদ্ধে যোগদান না করার কারণ হলো ১৯২৫ সালে রাশিয়ার সাথে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। তুরস্ক যুদ্ধে যোগদান করতে চাইলে রাশিয়ার মতামতের প্রয়োজন ছিল। আঙ্কারা চুক্তির ১নং শর্ত রাশিয়াকে জানানো হলে, রাশিয়া তুরস্কের যুদ্ধে যোগদানের বিপক্ষে মত প্রদান করে এবং তুরস্ক যুদ্ধে যোগদান করলে রাশিয়া তুরস্ক আক্রমণ করবে বলে হুমকি প্রদান করে।[২] আঙ্কারা চুক্তির শর্ত অনুসারে এবং রাশিয়ার বাধার পরিপ্রেক্ষিতে তুরস্ক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান হতে বিরত ছিল।

গ্রিসের উপর ইতালির আক্রমণ ও তুরস্ক

১৯৪০ সালে ইতালি গ্রিস আক্রমণ করে। ১৯৩৯ সালে আঙ্কারা চুক্তির শর্তানুসারে ফ্রান্স ও ব্রিটেন রুমানিয়া ও গ্রিসের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইতালি আক্রমণের প্রেক্ষিতে গ্রিস ও রুমানিয়া যদি সাহায্য করে তবে তুরস্ক তাদের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করবে। সুতরাং গ্রিসের উপর ইতালি আক্রমণের ফলে ব্রিটেন অল্প সময়ের মধ্যে তুরস্ককে যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানায়।[৩] কিন্তু তুরস্ক জার্মানির হুমকির সম্মুখীন হয় এবং এ হুমকির ফলে তুরস্ক যুদ্ধে যোগদান হতে বিরত থাকে। তুরস্ক গ্রিস আক্রমণ না করার জন্য বুলগেরিয়াকে একটি চরমপত্র প্রদান করে। ফলে বুলগেরিয়া আর গ্রিস আক্রমণ করেনি। ইতালি স্যালোনিকা দখল করলে বা বুলগেরিয়া গ্রিস আক্রমণ করলে তুরস্ক গ্রিস ও ব্রিটেনকে জানিয়েছিল তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। বুলগেরিয়া কর্তৃক গ্রিস আক্রমণ বা ইতালি কর্তৃক স্যালোনিকা দখল বাস্তবে পরিণত না হওয়ায় তুরস্ককে যুদ্ধে যোগদান করতে হয়নি।[৪]

বলকান উপদ্বীপে জার্মানির সংশ্লিষ্টতা ও তুরস্ক

১৯৪১ সালের প্রথম ভাগে বলকান উপদ্বীপে বিশেষ করে রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ায় জার্মানির কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। বলকান উপদ্বীপে জার্মান কার্যাবলী বৃদ্ধি পেলে রাশিয়া, তুরস্ক ও ব্রিটেনের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাশিয়া ও জার্মানির সম্পর্কের অবনতি ঘটার কারণে তুরস্কের সাথে রাশিয়া ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছিল।

মধ্যপ্রাচ্যের উপর সুযোগ নেয়ার জন্যই জার্মানি বুলগেরিয়ার উপর প্রভাব বৃদ্ধি করে। বিশেষ করে ইরাক ও ইরানের তেলের উপর জার্মানির প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে সুয়েজ খাল তাদের নাগালের মধ্যে আসে। বলকান উপদ্বীপে জার্মানির প্রভাব ব্রিটিশদের ভয়ের কারণ হয়ে দাড়ায়। এ সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তুর্কি প্রধানমন্ত্রী ইসমেত পাশাকে একটি পত্র পেরণ করেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ককে অংশ গ্রহণ করতে বলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুরস্ক ব্রিটেনের কথায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি।[৫] তুরস্ক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার আরও কিছু কারণ বিদ্যমান ছিল। যথা- (১) রাশিয়ার মনোভাব সম্পর্কে তুরস্ক ওয়াকিবহাল ছিলনা (২) তুরস্কের উপর জার্মান চাপ বৃদ্ধি পায় এবং তুরস্ক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করুক জার্মানি তা চায়নি।[৬] ফলে তুরস্ক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। বলকান উপদ্বীপে ব্রিটিশ জার্মানির বিপক্ষে চারটি দেশ তুরস্ক, গ্রিস, যুগোশ্লাভিয়া ও বুলগেরিয়ার সমন্বয়ে একটি ব্লক গঠন করতে চেয়েছিল। তুরস্ক রাজি হলেও বাকি রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কোন চুক্তি না হওয়ায় তা সম্পাদিত হয়নি। এর অন্যতম কারণ ছিল যুগোশ্লাভিয়া জার্মানির ভয়ে ভীত ছিল। এছাড়াও তুরস্ক এ চুক্তিতে রাশিয়ার যোগদানের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের প্রস্তাব দেয়।[৭] কারণ চুক্তিভুক্ত দেশগুলোকে ব্রিটেন একাকী পর্যাপ্ত যুদ্ধের উপাদান সরবরাহ করতে পারবে না। এছাড়াও তুরস্ক নিজের নিরাপত্তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট কিছু বিমান দাবি করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অতিরিক্ত দাবি বলে মনে করে। ফলে আলোচনা ব্যর্থ হয়। এ কারনেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক যোগদান করেনি।

তুরস্কের উপর জার্মান চাপ

জার্মানি ১৯৪১ সালে রাশিয়া ও তুরস্কের সম্পর্কের উন্নতি ভালো চোখে দেখেনি। ফলে তুরস্কের উপর জার্মান ভীতি ও জার্মান চাপ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪১ সালে রশিদ আলী জিলানী ইরাকের ক্ষমতা দখল করে এবং তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় শক্তির সমর্থক। তিনি জার্মানির কাছে সাহায্য চাইলে জার্মানি তার আবেদনে সাড়া দেয়। জার্মানির সাহায্যে সাড়া দেয়ার অন্যতম কারণ ছিল রশিদ আলী ক্ষমতায় থাকলে মধ্যপ্রাচ্যের তেলের উপর জার্মানির নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। এজন্য জার্মানি তুরস্কের মধ্য দিয়ে গোপনে সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র পাঠাতে চেয়েছিল। কিন্তু তুরস্ক জার্মানির এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করেনি। জার্মানি তুরস্ককে রাজি করানোর জন্য পশ্চিমে থ্রেস ও ইজিয়ান সাগরের কিছু দ্বীপমালা তুরস্ককে দেয়ার প্রস্তাব করে, কিন্তু তুরস্ক স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল থাকে। ফলে জার্মানির আশা-আকাঙ্খা ব্যর্থ হয়।[৮] তুরস্কের এ সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও জার্মানি তুরস্কের উপর চাপ সৃষ্টি অব্যাহত রেখেছিল। তুরস্ক এভাবে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদকে জার্মানির হাত থেকে রক্ষা করেছিল। এছাড়াও তুরস্কের বিরোধিতার ফলে রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চল জার্মানির আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পায়। এভাবে তুরস্ক মিত্র শক্তি বা অক্ষ শক্তির পক্ষে অংশগ্রহণ না করে নিরপেক্ষ ছিল।

তুরস্কের উপর নতুন জার্মান চাপ

রাশিয়াকে আক্রমণ করে জার্মানি ককেশাস অঞ্চলের মধ্য দিয়ে পারস্য উপসাগরের দিকে ধাবিত হয়। জার্মান সেনাপতি রোমেল আফ্রিকাতে সুয়েজ খাল দখল করতে পারলে জার্মান কর্তৃক তুরস্ক সবদিক দিয়ে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়বে। এভাবে তুরস্ককে জার্মানির নিজ দলে নেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান করলে তুরস্কের উপর এ চাপ আরও বৃদ্ধি পায়। তুরস্কের প্রতি রাশিয়ার বিমাতাসুলভ আচরণ তুরস্ককে মনে করিয়ে দেয় জার্মানি যাতে তুরস্কের পক্ষে আসে। জার্মানি পরাজিত হলে তুরস্কে রাশিয়া ভীতি প্রবল হয়। যদিও ১৯৩৯-১৯৪১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে তুরস্কের প্রতি রাশিয়ার খারাপ ব্যবহার কোনক্রমেই ভুলবার নয়। রাশিয়াকে ধ্বংসের জন্য জার্মানি তুরস্ককে

লোভনীয় প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী এ প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী মনে করেন যে, এ সময় তুরস্কের জন্য নিরপেক্ষ নীতি সর্বোৎকৃষ্ট। তুরস্কের এ অবিচল সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তুরস্ককে স্বীয় দলে নেয়ার জার্মান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।[৯]

তুরস্কের উপর মিত্র পক্ষের চাপ

১৯৪২ সালের শেষের দিকে জার্মান চাপ হ্রাস পেলে তুরস্কের উপর মিত্র পক্ষের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধের মোড় পরিবর্তনকারী হিসাবে কাজ করে। এ ঘটনার পর হতে তুর্কি-রুশ সম্পর্ক নতুনভাবে শুরু হয় এবং বিপরীত দিকে বাতাস বইতে থাকে।[১০] তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়া ১৯৪৩ সালে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে যা রীতিমতো হুমকিতে পরিণত হয়। রুজভেল্ট ও চার্চিল ১৯৪৩ সালে একটি আলোচনায় মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন তুরস্ককে যোগদানের মাধ্যমে বলকান উপদ্বীপে একটি নতুন ফ্রন্ট খোলার। এ সিদ্ধান্তটি চার্চিল তুরস্ককে জানায় এবং যুদ্ধে যোগদানের আহ্বান করে। যুদ্ধে যোগদানের পূর্বে তুর্কি সেনাবাহিনীর জন্য উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র দরকার বলে তুর্কি প্রেসিডেন্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তুরস্কের এই দাবি অতিরঞ্জিত বলে মনে করে ব্রিটেন। ফলে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তুরস্কের সম্পর্কের অবনতি ঘটে।[১১] এ সময় চার্চিল ঘোষণা করেন যে, তুরস্ককে শান্তি সম্মেলনে পূর্ণ মর্যাদা দেয়া হবে না। তুরস্কের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র তুরস্ককে তাদের আওতায় আনতে চেয়েছিল।[১২] কিন্তু নানা শর্তের কারণে তুরস্ক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেনি।

ইয়াল্টা সম্মেলন

মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্র নেতাদের যুদ্ধ চলাকালীন যে সকল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে ইয়াল্টা সম্মেলন ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়ার ক্রিমিয়া প্রদেশের ইয়াল্টা শহরে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[১৩] এ সম্মেলনে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও রাশিয়ার স্ট্যালিন শেষ বারের মতো মিলিত হয়ে আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।[১৪] এ বৈঠকেই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করার সিদ্ধান্ত সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।[১৫] সোভিয়েত রাশিয়া ইয়াল্টা সম্মেলনে তুরস্কের সাথে স্বাক্ষরিত অনাক্রমণ ও নিরপেক্ষ চুক্তি বাতিল করে। কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিবর্তিত অবস্থায় চুক্তিটি ছিল অসামঞ্জস্যপূর্ণ। জার্মানির পরাজয়ে রাশিয়া এর শূন্যস্থান পূরণ করতে উদ্যত হয় এবং তুরস্কের প্রতি তার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ব্যক্ত করে। ফলে তুর্কি-রুশ সম্পর্কের অবনতি হয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পটসড্যাম সম্মেলন (১৭ জুলাই থেকে ২ আগস্ট, ১৯৪৫) আহূত হয়। এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জোসেফ স্টালিন (সোভিয়েত ইউনিয়ন), উইনস্টন চার্চিল পরে ক্লেমেন্ট অ্যাটলি (যুক্তরাজ্য), হ্যারি এস.ট্রুম্যান (যুক্তরাষ্ট্র)। এ শান্তি সম্মেলন আহ্বানের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ পরবর্তী জার্মানির প্রশাসন পরিচালনা, যুদ্ধ পরবর্তী শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা। এ সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য ছিল ১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানির ভাগ্য নির্ধারণ, ২) ইউরোপ পুনর্গঠন, ৩) জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরবর্তী পরিকল্পনা, ৪) আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার রূপরেখা নির্ণয়।

উপসংহার

আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, বিশ শতকের সকল সংঘর্ষের মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর যুদ্ধটি শুরু হয়ে গিয়েছিল এসময়ে।[১৬] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল এক বিশাল বৈশ্বিক সংঘাত, যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে বিশ্বের চিত্র পাল্টে দেয়। যুদ্ধ শেষে নতুন আন্তর্জাতিক কাঠামো তৈরি হয় ও মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। এটি ছিল বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক

ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, সেখানে প্রায় ১০ কোটির বেশি সৈন্য অংশ নেয় এবং ৭ কোটির বেশি মানুষ নিহত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত তুরস্ক বৃহৎ শক্তির চাপ সত্ত্বেও নানা উপায়ে নিরপেক্ষ থাকতে পেরেছিল। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তুরস্ক অক্ষ শক্তি এবং মিত্র শক্তি উভয়ের মধ্যে সমান দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। তবে তুরস্ক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান না করলেও উভয় ব্লক যুদ্ধকালীন সময়ে তুরস্কের উপর তাদের চাপ বজায় রেখেছিল।[১৭] প্যারিসের পতনের চারদিন পর তুর্কি রাষ্ট্রপতি ইসমেত ইনোনু সন্দেহ করেন যে, তার দেশ আবারও ভুল দিকে যেতে পারে। এ জন্য তিনি সর্বদা নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করেন। পরিস্থিতি সংশোধনের জন্য তিনি জার্মান-তুর্কি বন্ধুত্ব চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, যার মাধ্যমে তুরস্ক অনির্দিষ্টকালের নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ইসমেত পাশার দূরদর্শিতার কারণেই তুরস্ক যুদ্ধের বাইরে থাকতে সক্ষম হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা হতে রক্ষা পায়।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ মুহম্মদ আলী আসগর খান, *আধুনিক তুরস্কের ইতিহাস* (১৯১৯-১৯৮০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১।

২ *তদেব*, পৃ. ২১২।

৩ *তদেব।*

৪ *তদেব*, পৃ. ২১৩।

৫ অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *তুরস্কের ইতিহাস*, নভেল পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৬৭।

৬ *তদেব।*

৭ *তদেব*, পৃ. ১৬৮।

৮ আব্দুস সাহিদ, *আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস*, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ২৯৫।

৯ মুহম্মদ আলী আসগর খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫।

১০ অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১।

১১ *তদেব*, পৃ. ১৭২।

১২ এ বি এম হোসেন, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস: আটোমান সাম্রাজ্য থেকে জাতিসত্তা রাষ্ট্র*, উপমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২০৩।

১৩ অধ্যাপক দিলীপ কুমার সাহা, *ইউরোপের ইতিহাস*, ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩৬৪।

১৪ *তদেব।*

১৫ অতুল চন্দ্র রায় ও প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, *আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস*, মৌলিক লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৭৪৩।

১৬ Antony Beevor, *The Second World War,* Little Brown and Company, London, 2012, P. 3.

১৭ মুহম্মদ আলী আসগর খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৮।